অষ্টম অধ্যায়

খুকুনীর মাতৃদর্শন

একদিন দেখি, শশাঙ্কবাবু ও খুকুনী আসিয়াছে। খুকুনী এই প্রথম আসিল। কোন স্ত্রীলোক আসিলে পান ও সিন্দুর দিতাম। খুকুনীকেও পান দিতে গেলে তাহার বাবা বলিল সে পান খায় না — তবুও আমি দিলাম। অন্য কোঠায় খুকুনীকে নিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলাম — এতদিন কোথায় ছিলে? সেও হাসিল। খুকুনীর কি কথা ছিল, সেও বলিল, এ শরীরও কি কি বলিল। ইতিমধ্যে শরীরের ভাব কেমন হইয়া গেল। উহাকে বলিলাম — তুমি বস, আমি আসি। সে ভাবিল আমি অন্য কোথায়ও যাইব। কিন্তু শরীরটা বলিতে বলিতে এমন একটা ভাবে এলাইয়া সেখানেই মাটিতে শুইয়া পড়িল। খুকুনীরও পূর্বের বিশেষ আধ্যাত্মিক সূত্রেই এই শরীরের কাছে আসা। আমি যখন চৈত্রমাসে বাজিতপুর হইতে আসি, তখন ভোলানাথের ভাইয়ের বাসায় উঠিয়াছিলাম। সে সময় একবার টিকাটুলিতে যাই, রাস্তায় শশাঙ্কবাবুর বাড়ির সম্মুখে যে জলের কলটি আছে, তাহাতে পা ধুই। তখন সে বাড়ি দেখিয়াই খেয়াল হইয়াছিল যে এ বাড়িতে একদিন আসা হইবে। শোয়ার কিছু পরেই উঠিয়া আবার তাহার সঙ্গে কথা কহিলাম। পরে তাহারা চলিয়া গেল।

ভোলানাথের কথায় নানা স্থানে যাওয়া

ভোলানাথের কথায় নানা জায়গায় যাইতে হইত ও নানা ব্যারাম সম্বন্ধে কথা বলিতে হইত। তাহার অন্তঃকরণটি কোমল দেখিয়া তাহাকেও সকলে পাইয়া বসিত এবং কিছুতেই ছাড়িত না। এ কারণে কখনও কখনও এ শরীর না করিলেও ভোলানাথ এ শরীরের উপর পীড়াপীড়ি, কখনও কখনও বা রাগ করিত।

ননীবাবুর বাসায় এ শরীর যাইত। তাহাদের বাসার লাগা নিশিবাবুর বাসা ছিল। নিশিবাবুর মেয়ে লিলি পিত্রালয়ে আসে। তাহার স্বামী বিলাত গিয়াছে। প্রথম একটি ছেলে, মাত্র তিন মাস বয়স।

লিলির খুব অসুখ। এ শরীরকে তাহাদের বাসায় লইয়া গেল। পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলে বলিলাম — অসুখ, ডাক্তারকে দেখাও, এ শরীর কি বলিবে? তখন ভোলানাথ বলে — তুমি যাহা হয় একটা বল। হাসিতে হাসিতে বলিলাম — তুই ফল খা, আমি যাইয়া ভাত খাইব। তোর খাওয়াটা আমি খাইব। এ বলিয়া সাহবাগে চলিয়া আসিলাম। লিলি ক্রমে ক্রমে ভাল হইয়া গেল।

কিছুদিন পর তাহার তিনমাসের ছেলেটির কর্ণমূল হইল। ডাক্তার বলিয়াছে পাকিয়াছে, অস্ত্র করিতে হইবে। শিশুটি খুবই দুর্বল। এ কারণে সকলের ভয় হইয়াছে। অস্ত্র করিতে পাছে না শরীর যায়। নিশিবাবু আসিয়া খুব কাতরে বলিতে লাগিল — তুমি যাহা বল তাহাই করিব। এ শরীর বলিল ডাক্তার যাহা বলে তাহাই কর। ভোলানাথ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। তখন কি এক খেয়াল আসিল তাহাকে বলিলাম — আচ্ছা! লিলিকে যাইয়া বল, আজ সন্ধ্যার সময় অন্ধকারে না দেখিয়া মাটিতে হাত দিয়া হাতে যাহা উঠে তাহা বাটিয়া ঐ কর্ণমূলে লাগাইয়া দিতে। সে তাহাই করিল। উহা লাগাইবার পর ঐ রোগা শিশুটি হাসিতে ও খেলিতে লাগিল। সকলে অবাক।

উহার ভিতর একদিন শশাঙ্কবাবুর বাসায় গেলাম; সেই দিনই তাহার বাসায় প্রথম যাওয়া। যাইয়া কিছুক্ষণ বসিয়াছি। দেখি নিশিবাবু আসিয়া কাঁদ কাঁদ অবস্থায় বলিতেছে ঐ শিশুর কানের ভিতর দিয়া পচা গন্ধ বাহির হইতেছে। ডাক্তার বলিয়াছে অস্ত্র না করাতে মাথার ভিতর পর্যন্ত দূষিত হইয়াছে। এখন কি উপায় করি? আরো বলিল, শিশুর পিতামহ অবস্থাপন্ন লোক। যদি বিনা চিকিৎসায় কিছু বিপদ ঘটে তবে কথা শুনিতে হইবে। এই সব বলিতে বলিতে তাহার চোখের জল পড়িতে লাগিল। তখন আবার বলিল — একবার যাইয়া শিশুটিকে দেখিতে হইবে। এখনই আবার চলিয়া আসিও। চল চল। যাইয়া দেখি শিশুটি হাসিতেছে, যেন কোন কষ্ট নাই। কর্ণমূলটি খুব বড়, দেখিতে সকলের ভয় হয়। আমরা সাহবাগে ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন নিশিবাবু আবার আসিয়া তাহাদের বাসায় নিয়া গেল। বলিল কর্ণমূলটি গলিয়া না যাওয়া পর্যন্ত কিছুতেই আসিতে দিবে না। পূর্বদিন সাহবাগে নাচঘরে ঘুরিতে ঘুরিতে একটি গ্রামোফোনের পিন চোখে

পড়ে। তাহা নিয়া এ শরীর বাম হাতের উপর কতকটা ক্ষতের মত করিয়াছিল। তখন কাহাকেও বলা হয় নাই। আজ যখন নিশিবাবু আপনা হইতে নিতে আসিল তখন খেয়ালে আসিল উহা গলিয়া যাইবে। পরে আমরা সেখানে থাকিতে থাকিতে ফোঁড়াটা গলিয়া গেল ও ক্রমে ক্রমে শিশুটি ভাল হইয়া উঠিল।

শশাঙ্কবাবুর মাতৃপূজা

শশাঙ্কবাবুর সঙ্গে দেখা হইবার কিছুদিন পরে একদিন অমাবস্যায় তাহাদের বাসায় নিয়া এ শরীরকে পূজা করিতে লাগিল। তখন যদি কেহ এ শরীরকে পূজা করিত অথবা গায়ের উপর ফুল দিত, তবে শরীর কেমন এলাইয়া মাটিতে ঢলিয়া পড়িত। নমস্কার করিলেও এ শরীরের মাথা মাটিতে নুইয়া পড়িত। শশাঙ্কবাবুর পূজার সময়ও শরীরের অবস্থা তাহাই হইল। কাপড়াদির সহিত একটি সোনার মুণ্ডমালা গলায় পরাইয়া দিল। পরে প্রকৃতিস্থ হইলে ভোলানাথ বলিল — মুণ্ডমালাটি উনি এত আগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, এখন খুলিও না। তাহা গলায় অনেকদিন ছিল।

পূজার পর শরীরটা উঠিলে শশাঙ্কবাবুকে বলা আসিল — আজ হইতে তোমার নিজস্ব বাহ্য পূজা বন্ধ হইয়া গেল। তাহারও আর এইরূপ পূজা করিবার ইচ্ছা জাগিত না।

এইরূপ অবস্থায় কয়েকদিন গেলে শেষে দেখা গেল, ফুল, চন্দন, বেলপাতা যে যাহা শরীরের উপর দিক না কেন, কোন পরিবর্তন দেখা যাইত না। খেয়ালে আসিত এ শরীর আর মাটিতে, ফুল, চন্দন, ময়লাতে কোন তফাৎ নাই। যেমন কাহাকেও ডাকিয়া আনা হইত না, আবার আসিলেও তাড়াইয়া দেওয়া হইত না। কথাবার্তাও আপনা হইতে মুখে যখন যাহা বাহির হয়, বলা হইত। এ শরীর বলে কি — তোমাদের ভাবে তোমরা মুখ হইতে যাহা বাহির কর, বা যাহা তোমরা দেখিতে, শুনিতে চাও, তাহাই অনেক সময় এ শরীরে আপনা হইতেই প্রকাশ হইয়া যায়। দেখ, সাধকের কোন সময় একটা ভাব হয় যে — কেহ তাহাকে প্রণাম পূজাদি বা গায়ে ফুল চন্দনাদি দিলে, ঐশ্বরিক ভাবের স্থিতিতে তাহার বাহিরের শরীরটা পর্যন্ত স্থির করিয়া দেয়। তাহার শরীরটা বাহিরে জড়বৎ দেখায়।

সাধনের উৎকৃষ্টতার সঙ্গে সঙ্গে 'সবই সমান' এই ভাব আসিয়া পড়ে। তিনি যেমন অনন্ত, সাধকের অবস্থাদিও তেমন অনন্ত। এই যে অনন্ত বলা হইল, এই যে রকমটা, সাধক যখন এক একটা দিক নিয়া সাধনা করিতে করিতে চলে, তাহাদের এই রকমটা হওয়া স্বাভাবিক। এ শরীর উপস্থিত তখন এক একটা দিক নিয়া খেলিতেছে ত। তাই এই রকমেরও একটা দিক ঐ সময়ে প্রকাশ সাময়িক। এই রকমে আরো কত নানা রকমটাই ত খেলিয়াছে। এই শরীরে তখন সাধকের খেয়ালটা চলিতেছে ত। নিজের খেয়ালে, এক একটা সাধনার দিক নিয়া খেলা আপনা হইতেই কিন্তু। আর কত শুনিবে ?

সূর্যগ্রহণে প্রকাশ্য কীর্তন

পৌষ সংক্রান্তি আসিল। সেইদিন আবার সূর্যগ্রহণও ছিল। যাহারা সাহবাগে আসা যাওয়া করিত তাহারা সেইদিন এখানে কীর্তন করিবে বলিয়া বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল। বাগানে বেশী লোকজন আসা বাগানের মালিক তত পছন্দ করিত না। সর্বদা যেন বেশী লোক না আসে এইরূপ নিষেধ ছিল। যাহা হউক, যোগেশবাবু সাহবাগে আসিলে ভোলানাথের কথায় সংক্রান্তির কীর্তনের কথা তাহাকে বলা হইল। সেও স্বীকৃত হইল। সকলে ঐ দিন কীর্তন ও পরে খিচুড়ি মিষ্টান্ন ভোগাদির ব্যবস্থা করিল।

প্রাতে নয়টা দশটার সময় কীর্তন আরম্ভ হইল। উপস্থিত বসিয়া মেয়েদিগকে সিন্দুর দিতেছিলাম। দেখি এ শরীরটা ক্রমে অবশ হইতেছে। সিন্দুরের কৌটা হাত হইতে পড়িয়া গেল। শরীর মাটিতে ঢলিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ মাটিতে গড়াইয়া শরীরটা উঠিল এবং পায়ের দুই বৃদ্ধাঙ্গুলির উপর খাড়া হইয়া, দুই হাত উপর দিকে তুলিয়া ও মাথাটি একেবারে পিছনে পিঠের সহিত লাগাইয়া পলক-বিহীন, স্থির উর্ধ্ব দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিল। এই রকম অবস্থা নিয়া চলিতে লাগিল। কোথায় বা যাওয়া হইতেছে, মাথায় গায় কাপড়াদি আছে কিনা কোন খেয়ালই নাই। সংজ্ঞা সম্পূর্ণ আছে কিন্তু বাহিরে প্রকাশ হইতেছে না। এক বিরাট ভাবে পরিপূর্ণ। যেমন কুণ্ডে প্রজ্বলিত আগুন ঢাকা থাকিলে তাহার ঢাকনা একবার

খুলিয়া দিলে উর্ধ্বদিকে তাহার শিখা উছলিয়া উঠে, তেমনই এ শরীরটা এক মহান শক্তির উন্মাদনায় যেন নৃত্য করিতে লাগিল। এই নৃত্য জাগতিক ভঙ্গীর না। কেমনই যেন একটা, রকম ব্যক্ত করা যায় না। চলিতে চলিতে এ শরীর কীর্তনের ঘরে যাইয়া পড়িয়া গেল। মাটিতে পড়িয়াই তুফানে যেমন কাপড় উড়াইয়া নেয় সেইরূপ ভাবে গড়াইতে লাগিল। কাহারো বাধা মানে না। কেহ ধরিয়াও রাখিতে পারে না। প্রবল ঝড়ে কেহ ডালপালা ধরিতে গেলে যেমন সেও নিজে গড়াইতে থাকে, সঙ্গীদেরও তেমন অবস্থাই হইয়াছিল। বহুদুর পর্যন্ত বিদ্যুৎ গতিতে গড়াইয়া গড়াইয়া পরে শরীরটা এলান ভাবেই উঠিয়া বসিল। সেই ভাবাবস্থাতেই মুখ হইতে ধীরে ধীরে বাহির হইল — 'হরে মুরারে-মধুকৈটভারে'। এই পদটি হইতে হইতে নেশায় ঢুলুঢুলু ভাবে শরীর বসিয়া রহিল। তখন প্রমথ-বাবুরও ইহা দেখিয়া একটা ভাবের অবস্থা হইল। এই ভাবের অবস্থাতেই হস্ত সঞ্চালনে এই শরীরকে আরতি করিতে লাগিল। আর দুই চোখে দরদর অশ্রুধারা। সে সময় তাহার উপর এ শরীরের আশীর্বাদের ভাব আপনা হইতেই হস্তদ্বারা প্রকাশ হয়। খানিক পরে গ্রহণও ছাড়িল, কীর্তনও থামিল।

শরীরটা অনেকক্ষণ একভাব থাকিল, পরে ভোলানাথ উঠাইয়া নিয়া গেল। শরীর টলিতে টলিতে রান্নাঘরে ভোগের ব্যবস্থাদি দেখিতে গেল এবং ঢুলুঢুলু অবস্থাতেই মেয়েদের সাহায্য করিতে লাগিল। তখন আবার কীর্তন আরম্ভ হইয়াছে। সন্ধ্যা যখন হইয়া আসিল, ভোলানাথ বলিল — লুট দিতে হইবে। তুমি শীঘ্র এস। কীর্তনে যাইতেই দেখি শরীর আবার অবশ হইয়া যাইতেছে এবং মধ্যাহ্নে যেইরূপ অবস্থাদি হইয়াছিল, খানিকটা সেই জাতীয় ভাবে ও আরো অন্য রকমে সকলের সঙ্গে ঘুরিতে লাগিল। পরে এক পায়ের উপর তাণ্ডবনৃত্যের মত কতক্ষণ হইয়া শরীরটা মাটিতে পড়িয়া আবার উঠিয়া বসিল।

দৃষ্টিতে যুবকের পরিবর্তন

সেই সময় দেখা গেল একটি বয়স্ক ছেলে এ শরীরের দিকে ও মেয়েদের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া হাসিতেছে। এ শরীরের চোখের দৃষ্টি এক পলকে তাহার উপর অনেকক্ষণ রহিল। দেখা গেল, সে হাসি বন্ধ করিয়া মাথা হেঁট করিয়া কাষ্ঠবৎ হইয়া রহিল। লুট ও ভোগের পর প্রসাদ বিতরণ আরম্ভ হইলে সকলে খাইতে গেল। কিন্তু ঐ ছেলেটি আর খায় না। তাহাকে খাইতে বলিলে সে বলে যে মা আমার উপর রাগ করিয়াছে। ইহা শুনিয়া এ শরীর বলিল — মা কাহারো উপর রাগ করে না। তুমি খাইতে যাও। সে খাইতে বসিল। আমি ও খুকুনী প্রায় দেড়শ লোকের পরিবেশন কারলাম।

পরদিন সেই ছেলেটি আসিয়া তাহার জীবনের যত দোষ ও অন্যায় আছে খুলিয়া বলিতে লাগিল। সে এম. এ. পাশ করিয়াছে। পূর্বে এক সময় যাত্রার দলে ছিল। তখন হইতে সে স্ত্রীলোকদিগকে, এমনকি তাহার আত্মীয়াদের পর্যন্ত সখী ভাবে দেখে। তাহাদিগকে নমস্কার করে না। কাহারো উপর মাতৃভাব একেবারেই আসে না। আরো বলিল — এক আপনার পায়ে মাথা নোয়াইলাম। আমার এই ভাব কি করিয়া দূর হয় কৃপা করিয়া বলুন। এই দোষের জন্য আমার ভাইয়েরা শাসন করে কিন্তু আমি শেষে ভুলিয়া যাই। এ শরীর বলিল — কাল কীর্তনে এত স্ত্রীলোকের ভিতর তোমাকে ঐরূপ ভাবে হাসিতে দেখিয়া এ শরীরের দৃষ্টি তোমার উপর প্রখর দেখাইয়াছিল। যে পর্যন্ত তোমার মাতৃভাব না জাগে, সে পর্যন্ত তুমি কোনও মেয়ে মানুষের মুখের দিকে দেখিও না। পায়ের দিকে চাহিয়া কথা বলিও। আজ হইতে এই সংকল্প কর। আর রোজ আসিয়া এইখানে নিবেদিত প্রসাদ নিও। সে স্বীকার করিল। ইহার পর একদিন দ্বিপ্রহরে আসিয়াছে। এমন সময় কয়েকটি মেয়ে আসিল। এ শরীর তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতেছে, দেখি কি, ছেলেটি মাথার উপর কাপড় টানিয়া দিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। এই রূপে আসা যাওয়া করিত। একবার আসিয়া বাড়ী যাইবে বলিয়া চলিয়া গেল তাহার পর আর এ শরীরের সঙ্গে দেখা হয় নাই। পরে শোনা গিয়াছিল তাহার ভাবের ভাল দিকে পরিবর্তন হইয়াছে।

পৌস সংক্রান্তির কীর্তনের পর হইতে প্রায় সন্ধ্যার সময় ও প্রতি অমাবস্যায় কীর্তন হইত। তাহাতে এ শরীরের এক একদিন এক এক রকম ভাব হইত। অমাবস্যার কীর্তন ভোগাদি হইতে প্রায় রাত্রি শেষ হইত।

স্ব-হস্তে অন্নগ্রহণে অক্ষমতা

কয়েকদিন যাবৎ রোজ ভাত খাইতেছি। একদিন রাজেন্দ্র কুশারীর বাসায় এ শরীরকে খাইতে বলিল। তখন কথা বন্ধ ছিল। খাইতে বসিয়াছি দেখি কি ভাত মাখিয়া মুখে দেওয়ার জন্য হাত উঠাই আর হাত হইতে সব পড়িয়া যায়। অথচ হাতও অবশ নয়। কিন্তু মুখের কাছে গ্রাস নিতে গেলেই হাত খুলিয়া যায়। অনেক চেষ্টা করিয়াও খাওয়া হইল না। সে বাসার লোকেরা খুব দুঃখিত হইয়া বলিল যে বোধ হয় আমাদের কোন ত্রুটি হইয়াছে। তাহাদের বলা হইল — এ শরীরে এইরূপ সময় সময় নানা রকম পরিবর্তন হয়। অথচ এই জাতীয় পরিবর্তনে অভাব বোধের স্থান ছিল না, সোজা যন্ত্রের মত হইয়া যাইতেছে — একই ভাব। সাহবাগে ফিরিয়া আসিলাম।

সাহবাগে একদিন রাত্রে খাইতে বসিয়া দেখি নিজহাতে মুখে কিছু দিতে গেলেই হাত খুলিয়া সব পড়িয়া যায়। সেই জন্য মাটি হইতে থালাটি বাম হাতে লইয়া মুখের সামনে ধরিয়া ডান হাতে উহা হইতে তিন চার দিন কিছু কিছু খাইলাম। পরে দেখি ঐ ভাবেও মুখে হাত যায় না। জিজ্ঞাসায় মা বলিলেন — খাওয়া ঠিকমত হইতেছে না বলিয়া শরীরের কোন পরিবর্তন নাই। খাইয়াও যেমন, না খাইয়াও তেমন। তখন করিলাম কি থালাতে ডাল তরকারী একসঙ্গে মিশাইয়া সেই সব বাম হাতে একেবারে যতটা ধরে ততটা মুখের কাছে নিয়া ডান হাতে গ্রাস করিয়া খাইতে লাগিলাম। দুই এক দিন পরে দেখি সেইরূপেও আর খাওয়া হয় না। মুখে ভাত দিতে দিতে হাত খুলিয়া যায়। ভোলানাথ লক্ষ্য করিতেছে যে আমার খাওয়া হয় না। একদিন ভোলানাথ খাইতে বসিয়া ডাকিল। আমি তাহার নিকট দুই হাতে অঞ্জলি করিয়া বসিয়া বলিলাম — আমার হাতে যা হয় একেবারে দাও। ভোলানাথ যাহা দিল আমি দুই হাত হইতে মুখ দিয়া লইয়া খাইলাম।

একদিন দেখি মুখের কাছে হাত দুইখানি কিছুতেই যায় না। লজ্জাবতী লতাকে স্পর্শ করিতে গেলে পাতাগুলি যেই রূপ আপনা হইতে কুঞ্চিত হইয়া আসে, সেইরূপ মুখের কাছে হাত লইতেই সমস্ত শরীর যেন অবশ কেমন ভাব হইয়া যায়। সে সময় সব

এলাইয়া পড়ে। হাত মুখে উঠাইয়া ভাত কেমন করিয়া খায় তাহাও যেন বে-খেয়াল হইয়া গিয়াছে।

এ যেন ছেলেমানুষ — এ সব লইয়া খেলিতেছিল। ক্ষুধা, খাওয়া এ যেন নিশ্চিহ্ন-শান্তভাব। ভোলানাথ জিজ্ঞাসা করিলে, এই শরীর ছেলেমানুষের মত কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল — এ শরীর ত ইচ্ছা করিয়া কিছু করে না, হাত উঠে না, খাইতেও পারে না। ভোলানাথ বলিল — আচ্ছা! আমি খাওয়াইয়া দিই। সেইদিন হইতে হাতে খাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। এ অবস্থায় প্রথম প্রথম দেখা যাইত যে খাওয়াইত সেও বসিত। তাহা না হইলে ঐ সময় আর খাইব না, বলিয়া আপনা হইতে উঠিয়া পড়িত। পরে খেয়াল হইল যে একগাছি দুর্বা দুই আঙ্গুলে যে ভাবে উঠায় সেইভাবে সকল খাবার দ্রব্যাদি এক সঙ্গে মিলাইয়া একবার মাত্র মুখে দেওয়া হইবে। যাহারা খাওয়াইত তাহারা দুইবেলা এই নিয়মেই চলিত। একদিন পর একদিন, জলও ঐ সঙ্গে একবার খাওয়াইত। প্রায় সাড়ে পাঁচমাস এইরূপ কাটাইবার পর বাসন্তী পূজার সপ্তমীর দিনে জ্যোতিষের বাসা হইতে দুধ আসিল। এ শরীর কেবল তাহাই খাইল। এইরূপে তিনদিন সামান্য দুধই এ সময় খাওয়া হইল। দশমীর দিন রাত্রিতে অন্ন খাওয়া হইল।

সমস্তের মূলে সূক্ষ্ম সূত্র আছে ত। সেই সূত্র হইতে আবার সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম যে সূত্র আছে তাহার দ্বারাই সমস্ত কর্ম নানারকমে নানাভাবে সম্পন্ন হয়। যেমন কর্ম জগতে, তেমন পরমার্থ জগতে নানা লাইন ধরিয়া চলে। পরে পূর্বের মত কয়েকদিন খাওয়া হইল।

প্রায় চার পাঁচ বছর গত হইলে একদিন রমনা আশ্রমে সকলে নিজ হাতে খাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিল। এ শরীরেরও খেয়ালে আসিয়া গেল যে হাতে খাইব। খাবার নিয়া বসিলাম। দেখিলাম কেমন একটা ভাব, সারা আশ্রম ঘুরিয়া হাতে এক একবার সামান্য একটু মুখে দিই, আবার সামনে যাহাকে পাই তাহাকে দিই। কুকুর, বিড়াল, পাখী, ইত্যাদি তাহাদেরও দিই। এইরূপে বসিয়া চলিয়া অনেক সময় নিয়া মধ্যাহ্নের খাওয়া শেষ করিলাম। রাত্রে দেখিলাম সন্দেশ ও অন্যান্য খাবার দিয়াছে। আমি সব মাটিতে বেশ করিয়া লেপিয়া দিতেছি। খেয়াল হইতেছিল, মাটিতে মিলাইয়া দেওয়া আর এ শরীরকে খাওয়ানো একই কথা। এ সব ব্যাপার দেখিয়া সকলে বলিল — মা'র শরীর রাখিতে হইলে অন্যের

খাওয়াইয়া দেওয়া দরকার। না দিলে শরীর টিকিবে না। আবার অনেকে আবদার ধরিল — আমরা খাওয়াইয়া দিব। তাহার পর হইতে যে নিকটে থাকে বা যাহার আকাঙ্ক্ষা হয় সেই খাওয়ায়। কিন্তু আমি দেখি সবই আমার হাত। আমার হাতেই আমি খাই। যে হাতের খাওয়া ছাড়িয়া গেল, সেই হাতের খাওয়া আর তোমরা যাকে অপর বল, সেই হাতের খাওয়া — একাকার হইল আর কি।

একটি বালিকার রোগারোগ্য

সাহবাগে দ্বিপ্রহরে একদিন কি কাজ করিতেছি, এমন সময় কুমিল্লার রায়পুর নিবাসী একটি লোক তাহার স্ত্রী ও ছেলেপিলে নিয়া গাড়ী করিয়া আসিয়া ভোলানাথকে বলিল — মায়ের কাছে আসিয়াছি, আমার মেয়ে চার বছর যাবৎ শয্যাশায়ী অবস্থা। প্রথম তাহার জ্বর হয়, পরে শরীর অবশ হইয়া পক্ষাঘাতে দাঁড়াইয়াছে। বিছানায় পড়িয়া থাকে। বাহ্য প্রস্রাব আমাদের করাইতে হয়। বয়স ১২ বছর। তাহার বিবাহ দিয়াছি। এখানকার বড় ডাক্তার গুরুপ্রসাদ মিত্র তিন মাস চিকিৎসা করিয়াছেন। কোন ফল পাওয়া যায় নাই। তিনিও এখানে নিয়া আসিতে বলিয়াছেন। তাই নিরূপায় হইয়া আপনাদের নিকট আসিয়াছি। ভোলানাথ আসিয়া আমাকে এইসব জানাইল। হঠাৎ মুখ হইতে বাহির হইয়া গেল — সামনের বৃহস্পতিবার আসিতে বল। তাহারা তদনুযায়ী আবার বৃহস্পতিবারে আসিল। মেয়েটিকে তাহার বাবা ও মা দুইজনে ধরিয়া ঘরের মেঝেতে শোয়াইয়া দিল। দেখা গেল বসিবারও সাধ্য নাই। সে মেয়ে এত দুর্বল যে কথাও বলিতে পারে না। এ শরীর দাঁড়াইয়া তাহাকে লক্ষ্য করিতেছিল। পরে সেখানে বসিয়া তাহাকে বলিলাম — মাটির উপর একটু গড়াগড়ি দাও ত। সে যতটুকু আপন শক্তিতে পারিল, ততটুকুই গড়াগড়ির মত একটু দিল। পরে বলিলাম — আর দরকার নাই।

তখন ভোগের জন্য সুপারী কাটিতেছিলাম, তাহার কয়েকখণ্ড মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বলিলাম — এই সুপারীগুলি হাত বাড়াইয়া নাও। সে বহুকষ্টে সেইগুলি লইল। তাহারা বিদায় হইল। পরে শুনিলাম বাসায় যাইলে মেয়েটি নাকি খাওয়া দাওয়া করিয়া বিছানায় শুইয়া অন্যের সঙ্গে কড়ি খেলা করিতেছিল। তখন রাস্তায় গাড়ি ও বাজনার শব্দ শুনিয়া হঠাৎ লাফ দিয়া উঠিয়া গেল এবং দৌড়াইয়া গাড়ী দেখিয়া আসিল। তাহার পর হইতে সে ধীরে ধীরে চলাফেরা করিতে লাগিল। পরদিন তাহার পিতা আসিয়া হাসিতে হাসিতে ঐ ঘটনা জানাইল। শুনিয়াছি, সে মেয়েটি ক্রমশঃ সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছিল।

আশ্রমে পূর্ণিমার ভোগ

একদিন নিশিবাবুর বাড়ীতে ভোগ হইলে সাহবাগে ফিরিতে ফিরিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল। সেইদিন পূর্ণিমা রাত্রি। এদিকে মটরীর এক খেয়াল হইয়াছে যে তাহার ছেলের প্রথম চাকরীর বেতন হইতে সে পূর্ণিমার ভোগ দিবে। আমরা আসিয়া দেখি মটরী সকল রান্নাবান্না প্রস্তুত করিয়া বসিয়া আছে ও কয়েকজন মিলিয়া কীর্তন করিতেছে। যথা সময়ে ভোগ নিবেদন হইল ও সকলে আনন্দের সহিত প্রসাদ নিল। সেই পূর্ণিমার ভোগ আশ্রমে এখনও চলিতেছে। দেখা যাইত, সব বিষয়েই যখন যাহা হইবার আপনা হইতে হইয়া যাইত।

বাসন্তী পূজা ঃ লাবণ্যের ভাবাবেশ

বাজিতপুর থাকিতে ভোলানাথ একদিন বলিয়াছিল — আমার একটি আকাঙ্ক্ষা আছে যে বাসন্তী পূজা করিব। বাড়ীতে দুই-দুইবার শারদীয়া দুর্গাপূজার আয়োজন করিয়া মৃতাশৌচ পড়াতে সেই সব জিনিষপত্র দিয়া শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হয়। তাহার পর হইতে আর দুর্গাপূজার কোন কথা হয় নাই। তাই একবার বাসন্তী পূজা করিতে বড় ইচ্ছা হয়। বল দেখি — এ কামনা পূর্ণ হইবে কি? তাহাকে বলিয়াছিলাম — হইবে।

সাহবাগে আসার পর ভোলানাথ সে কথা স্মরণ করাইয়া দিল। সিদ্ধেশ্বরী আসনে সেই সময় শশাঙ্কবাবু একটি খড়ের ঘর করাইয়া দেন। সেখানে পূজা হইবে বলিয়া স্থির হইল। দুর্গামূর্তি এই শরীরের মাপে হইল এবং ঐ আসনের স্থানে যে উইয়ের ঢিবি ছিল, তাহার মাটি ও অন্য মাটি মিলাইয়া মূর্তি তৈয়ারী হইল। পূজা

উপলক্ষ্যে ভোলানাথের অনেক আত্মীয়, কুটুম্ব আসিয়া উপস্থিত। সাহবাগে যাহারা আসা যাওয়া করিত, তাহারা সকলে মিলিয়া নানা জিনিষ পত্রের আয়োজন করে। শশাঙ্কবাবু ও পূর্ণ সরকার ভগবতীর জন্য সোনার রুলী ও সোনা বাঁধান শাঁখা তৈয়ারী করিল। ভোলানাথের বোন বেঙ্গী (মোক্ষদা) অনেকদিন হল ঢাকা আসিয়াছিল। কাজেই কেহ আনিতে না গেলে তাহার এ পূজায় আসা হইবে না, এ আশঙ্কায় ভোলানাথ বলিল — চল, আমরা যাইয়া তাহাকে লইয়া আসি। তাহার কথায় চট্টগ্রাম যাওয়া হইল। পরে সকলে মিলিয়া ঢাকায় আসিলাম।

একদিন সন্ধ্যায় শশাঙ্কবাবুর বাড়ী গিয়াছি। দেখি তাহার ছোট ছেলে নন্দু আসিয়াছে। তাহার সঙ্গে এই প্রথম দেখা। পরে বরাবর সে এই শরীরের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিত।

খুকুনীর সহিত দেখা হইবার কিছুদিন পর তাহাকে বলিয়াছিলাম — তুমি যখন স্বামীর সহিত সম্বন্ধ রাখিবে না স্থির করিয়াছ তখন অন্যান্য আত্মীয় স্বজন সকলের কাছেই চিঠিপত্র লিখা বন্ধ করিয়া দাও। সে তাহাই করিয়াছিল। নন্দু একদিন বলিল — আমি ভাবিতাম দিদি এমন কার দেখা পাইল যাহার কথায় সে ভাই বোনদের খবর নেওয়াও বন্ধ করিয়া দিল। পরে যখন তোমার আদেশ জানিলাম, তখন মনে দুঃখ হইত। তোমার কাছে আসিতে ইচ্ছা হইত না।

বাসন্তী পূজার আর বেশীদিন বাকী নাই। দেখি জ্যোতিষের স্ত্রী একদিন একখানি মটকার লাল চওড়া পাড়ের সাড়ী আনিয়া এ শরীরকে আবদার করিয়া বলিল — আপনি ইহা ব্যবহার করিবেন। এ শরীর বাসন্তী পূজার সময় সেইখানা পরিয়াছিল।

ইহার ভিতর যে বাড়ীতে এখন ইণ্টারমিডিয়েট কলেজ সেখানে একটি বড় এগ্‌জিবিশন্ হইয়াছিল। জ্যোতিষের স্ত্রী এ শরীরকে সেখানে নিয়া গিয়াছিল। এ শরীর কোথাও এইরূপ যায় নাই, এই প্রথম। সে আমাকে অনেক জিনিষ দেখাইতে লাগিল ও বলিল — কোনটা পছন্দ হয় বলুন, কিনিয়া দিব। এ শরীরের কিন্তু সবই সমান, নূতন যে কিছু দেখা হইতেছে এমন খেয়ালে আসিল না।

আমরা বাসন্তী পূজার অধিবাসের দিন সাহবাগ হইতে সিদ্ধেশ্বরী গেলাম। সেখানে একটি খালি বাড়ীতে সকলের জায়গা করা

হইয়াছিল। সিদ্ধেশ্বরী আসনে, সেই খড়ের ঘরে মূর্তি ইত্যাদি তৈয়ার হইয়া গিয়াছে এবং অন্যান্যদের বন্দোবস্তও ঠিক মতই হইয়া গিয়াছে।

সপ্তমীর দিন প্রাতে এ শরীর পুকুরে স্নান করিয়া পূজা স্থানে যাইবার সময় ভোগের জন্য কত সের চাল, ডাল ইত্যাদি রান্না হইবে বলিয়া — পূজার ঘরে গেল।

পূর্বের আসন স্থানটি হইতে ঘরের ভিটা একহাত উঁচু ছিল। উহা এক হাত চার আঙ্গুল করিয়া চতুষ্কোণ। সেই জন্য আসনটি ঐ মাপের একটি কুণ্ডের মত দেখাইত। এ শরীর পূজার সময় সারাদিন সেই কুণ্ডের ভিতর বসিয়া শুইয়া কাটাইত। প্রাণ প্রতিষ্ঠার সময় পুরোহিতকে বলা হইল — প্রতিমার বীজাদি তোমার উচ্চারণ করিতে হইবে না। এ শরীর এক দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ মূর্তিগুলির দিকে চাহিয়াছিল। ভিতরে বীজাদি উচ্চারিত হইতেছিল। কেহ কেহ পরে বলিয়াছিল, সে সময় হইতে মূর্তিগুলির চোখ মুখ সহ সর্বাঙ্গ সজীব দেখাইতেছিল।

পূজার পর ভোগাদি নিবেদিত হইল। সকলে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিল। বৈকাল বেলা বেশ একটু ঝড়ের মত হইয়া গেল। রাত্রি কাটিয়া গেল।

তাহার পর দিন সকালে ভোগাদির ব্যবস্থা করিয়া পূজার ঘরে আসা হইল। অষ্টমী পূজা শেষ হইল। সকলের প্রসাদ নেওয়া প্রায় শেষ হইয়াছে। ইহার মধ্যে কে আসিয়া বলিল — একদল লোক এই মাত্র আসিয়াছে। যতটা প্রসাদ আছে তাহাতে কিছুতেই কুলাইবে না। যাহারা পূজা দেখিতে আসিবে, তাহারা সকলেই প্রসাদ পাইবে, কেহ যেন ফিরিয়া না যায়, এইরূপ ব্যবস্থা ছিল। নূতন দলে প্রায় ৪০/৫০ জন। ইহারা সকলেই স্থানীয় প্রাইভেট মেডিকেল স্কুলের ছাত্র। তাহাদিগকে একদিন আসিয়া পূজা দেখিবার জন্য বলা হইয়াছিল। এ শরীর বলিল — ইহাদিগকে বসাইয়া পাত্রে যাহা আছে, দিতে আরম্ভ কর। সকলে ভাবিল — যদি না কুলায় লজ্জার কথা হইবে। এ কারণে আবার দুই হাঁড়ি খিচুড়ী চড়াইল। রান্না হইলে পর তাহাদের খাওয়াইতে বসাইল। পরে দেখা গেল, পূর্বের পাত্র হইতে সকলকে পরিবেশন করা হইলেও তাহা খালি হইল না। নূতন দুই হাঁড়ি পড়িয়াই রহিল। পূর্বেই বলা হইয়াছিল,

ভোগের রান্না একবারে যাহা হয় করা আর যেন বসান না হয়। কিন্তু তাহারা সে কথা খেয়াল না করিয়া কম হইবে আশঙ্কায় আবার রান্না চাপাইয়াছিল।

বৈকালে খুব ঝড়ের সম্ভাবনা দেখা গেল। ক্রমে ক্রমে বৃষ্টি বাতাস, এইরূপ জোরে হইতে লাগিল যে সকলে ভয় পাইল। চারিদিকে হৈ চৈ। আসনের খড়ের ঘরখানি খুব হালকা ছিল। চারিদিকে পাতলা বেড়া। সামান্য কয়টি খুঁটির উপর চালটি খাড়া ছিল। উহা বাতাসের ধাক্কায় নড়িতে থাকিল। এই শরীর আসনের কুণ্ডে বসিয়া আছে। ভয়ানক তুফান। ১২ বছরের একটি মেয়ে ভয়ে ফিট হইয়া গেল। সকলেই ঘরের খুঁটিগুলি ধরিয়া 'মা মা' বলিয়া প্রাণভরে ডাকিতে লাগিল। এ শরীর দেখিল — বাহিরে জড় প্রকৃতির উদ্দাম নৃত্য আর ঘরে জীবের একনিষ্ঠ ভাব-ধ্বনি। ইহাতে কি এক অপূর্ব ভাবে এ শরীর তালে তালে নাচিতেছিল ও অস্বাভাবিক হাসি বাহির হইতেছিল। শেষে দেখা গেল — প্রতিমার গায়ে বাতাস লাগিয়া বেশ একটু নড়িতেছে। এই অবস্থায় ভোলানাথ আমাকে এইভাবে হাসিতে দেখিয়া আরও যেন বিব্রত হইল। এ শরীরের দিকে লক্ষ্য করিয়া কাঁদ কাঁদ ভাবে বলিতে থাকিল — এ কি হইল! শীঘ্র রক্ষা কর।

ইতিমধ্যে জলে কাদায় মাখামাখি হইয়া একটি নীচ জাতীয় লোক আসিয়া দরজায় প্রবেশ করিল এবং এই শরীরের দিকে দীন-ভাবে অসহায় অবস্থায় তাকাইয়া তাকাইয়া (যাহাতে কেহ তাড়াইয়া না দেয়) সকলের সঙ্গে নাম করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে তুফানের বেগ কমিয়া আসিল। প্রতিমার বা পূজার দ্রব্যাদির কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিল না। বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখি জলে জলময়। ছাপড়াগুলি কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। নিকটস্থ গাছের ডালপালা অনেক ভাঙ্গিয়াছে। মথুরাবাবু রাতারাতিই সব গুছাইয়া ঠিক করিয়া নিল।

এই দিকে একদল কীর্তনীয়া কোথা হইতে আসিয়া কীর্তন করিতে লাগিল। এই শরীরের কি একরকম অবস্থা হইল। সে সময় আশু, আশুর ছোটবোন, তাহার স্বামী ও আশুর মা, সকলে সেখানে উপস্থিত ছিল। ইহার মধ্যে আশুর বোনটি (১৬/১৭ বছর বয়স) নাম লাবণ্য সে শরীরের ভাবাবস্থা কখনো দেখে নাই। আমাকে একটু অপ্রকৃতিস্থ দেখিয়া হর্ষে ও বিস্ময়ে

আসিয়া জড়াইয়া ধরিল। ইহাতে তাহার শরীরের এমন এক পরিবর্তন হইল যে সে হরিবোল হরিবোল করিতে করিতে মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। এই শরীরের ঢুলু ঢুলু ভাব নিয়াও কীর্তনীয়াদের সঙ্গে সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে গিয়াছে, অন্যান্য অনেক লোকও গিয়াছে। তথায় কীর্তন বন্ধ হইলে সকলে এ শরীরকে লইয়া ঘরে আসিতেছে, এমন সময় দেখি লাবণ্যের মা ও আরো ২/১ জন আসনের সম্মুখস্থ উঠানে লাবণ্যের গায়ের কাদা সরাইয়া দিতেছে ও সে মাটিতে লুটাইতেছে। তাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না, ভাবে বিভোর। প্রসন্ন বদন, উর্দ্ধ দৃষ্টি, আধো আধো স্বরে কেবল 'হরিবোল' 'হরিবোল' করিতেছে।

শশাঙ্কবাবু বলিল আমি কালীবাড়ী হইতে আসিয়া প্রতিমা মণ্ডপে যাইতেছি, শুনিলাম নিকটে কোথায় যেন খুব সুন্দর সুরে হরিবোল ধ্বনি বাহির হইতেছে। আমি খুঁজিতে খুঁজিতে যাইয়া দেখি উঠানে কাদার ভিতর কে গড়াগড়ি দিতেছে আর ঐ শব্দ করিতেছে। অন্ধকার ছিল, নিকটে যাইয়া দেখি, লাবণ্য।

ইহার পূর্বে বেশ এক পশলা বৃষ্টি হইয়াছিল। সে সময়ে মেয়েটি সেইখানেই পড়িয়াছিল। তাহাকে ঘরে আনিয়া কাপড়াদি বদলাইয়া পরিষ্কার করা হইল কিন্তু উহার হরিবোল ও লুটালুটির ভাব আর যায় না।

আশুর মা আমাকে আসিয়া বলে — উহাকে শীঘ্র ভাল করিয়া দে — এ কি হইল? দেখিলাম তাহার স্বামীও যেন একটু বিচলিত। এ শরীর বলিল — ইহা খুব ভাল অবস্থা। তাহারা বলে এই অবস্থা থাকিলে সংসার কি করিয়া চলিবে? নানা কথার পর তাহার স্বামীকে বলিলাম, তুমি তাহাকে অন্য ঘরে নিয়া যাও। ভোলানাথকে বলিয়া দিলাম উহার স্বামী যেন তাহার কানে কানে এইরূপ বলে। সে তাহাই করিল। রাত্রিতে লাবণ্য নেশাখোরের মত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। ৩/৪ দিনে তাহার শরীর পূর্বাপেক্ষা স্থির হইয়া আসিল বটে কিন্তু হরিবোল হরিবোল করিয়া মাঝে মাঝে গড়াইত। তাহার মা তাহাকে একদিন বলে — এ জন্যই বুঝি খুড়ীমার নিকট যাইব বলা হয়। লাবণ্যকে তাহার মা ও তাহার স্বামী এইসব ভাব দূর করিবার জন্য নানা ভাবে বুঝাইল। কিন্তু তাহার আনন্দ বিগলিত সুরে হরিনাম মুখে লাগাই ছিল। প্রাতে

আমার সঙ্গে স্নান করিতে ঘাটে আসিয়াছে, সেখানে গিয়াও ঢল ঢল হাসি আর মুখে হরিবোল হরিবোল। এ শরীর বলিল তোর এইসব তোর মা ও অন্য আত্মীয়েরা পছন্দ করে না। সে পাগলের মত কেবল হাসে আর বলে — খুড়ীমা 'হরিবোল হরিবোল'। হরিবোলে যে কি আনন্দ তাহারা বুঝে না। তাহার মা বিশেষ ভাবে বলিতে লাগিল যে লাবণ্যকে ভাল করিয়া দাও। ক্রমশঃ তাহার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল ও সে দেশে চলিয়া গেল।

এই মেয়েটি তাহার জন্ম হইতে এ শরীরের হাতে প্রতিপালিত। শিশু সময় এ শরীরকে না হইলে, তাহার কিছুই ভাল লাগিত না। তাহার নাম 'লাবণ্য' এ শরীরই রাখিয়াছিল। বিবাহের পর সে এ শরীরকে দেখিলে গোপনে গোপনে বলিত — খুড়ীমা! আমার সংসার ভাল লাগে না। আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে রাখেন। তাহার কেমন একটা ভাবও হইত। অতিকষ্টে গোপনে রাখিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু মাঝে মাঝে বাহিরেও প্রকাশ হইয়া যাইত — যেন অসাড় অবস্থায় পড়িয়া আছে।

দশমীর দিন পুজা শেষ হইল। বিসর্জনের সময় জিজ্ঞাসা করে যে ভগবতীর হাতের রুলী ও শাঁখা কি করিব? এ শরীর বলিল — সঙ্গে দাও। ভোলানাথ ও অন্যান্য কেহ কেহ বলিলেন — ইহা নিয়ম নয়। এ শরীর পুরোহিতকে দিবার কথা বলিল। যাহারা গয়নাগুলি দিয়াছিল, তাহারা বলিল মা'র হাতে দিবার জন্য আমরা তৈয়ার করিয়াছি। এইরূপ নানা তর্কযুক্তি করিয়া সেইগুলি এ শরীরের জন্য ঘরে রাখিয়া দিল।

প্রতিমা বিসর্জনের পর সকলে বলিল — আমরা আজ মায়ের চরণ ধরিয়া প্রণাম করিব। এ শরীর কাহাকেও চরণ ধরিয়া প্রণাম করিতে দিত না। সেদিন সকলের সঙ্গে বৃদ্ধ সীতানাথ কুশারী মহাশয়ও জোর করিয়া প্রণাম করিলেন।

প্রণামে শরীরে প্রতিক্রিয়া

প্রথম সাহবাগে আসার পর কয়েকমাস পর্যন্ত কেহ মাটিতে পড়িয়া প্রণাম করিলে এ শরীরের মাথাও মাটিতে নুইয়া পড়িত। পায়ে হাত দিলে, তাহার পায়ে হাত যাইত। যে পায়ে হাত দিয়া নমস্কার করিত

সমাধির আবেশে ও সমাধি অন্তে শ্রীশ্রীমা

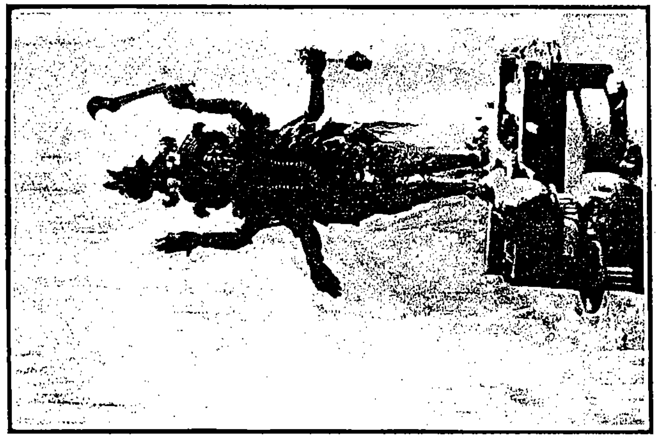

রমনা আশ্রমে কালী মূর্তি
(ইং ১৯২৬)

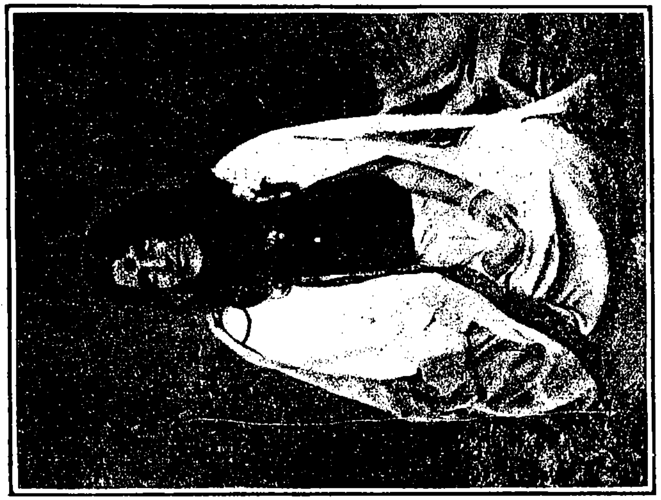

ভাবাবেশে শ্রীশ্রীমায়ের মূর্তি

সে দৌড়াইয়াও রক্ষা পাইত না। তখন এ শরীরে কেমন এক শক্তি প্রকাশের খেলা হইত যে এই শরীর সেই লোকের পায়ে হাত দিবেই দিবে। বাহিরে না দেখা অবস্থায়ও যদি কেহ এ শরীরকে লক্ষ্য করিয়া দূর হইতে নমস্কার করিত বা যদি কেহ এ শরীরকে কোন প্রকারে একটু দেখিয়া গোপনে মাটিতে পড়িয়া ইহার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিত, তবে এই শরীরের মাথাও মাটিতে নুইয়া যাইত।

কাঙ্গালী ভোজন

একবার ঢাকার প্রাইভেট মেডিকেল স্কুলে শশাঙ্কবাবু কাঙ্গালী ভোজন করাইলেন। সে উপলক্ষ্যে কীর্তন হইয়াছিল। কাঙ্গালী ভোজনের পূর্ব দিন রাত্রিতে আমরা সে স্কুলে গিয়াছিলাম। খিচুড়ি তরকারী মিষ্টি ইত্যাদি তৈয়ারের বন্দোবস্ত হইতেছে। পরদিন কাঙ্গালীরা খাইবে। সকালবেলা কতক্ষণ কীর্তন হইল। এ শরীরের পূর্বের মত ভাবাবস্থা। মধ্যাহ্নে ভোজন আরম্ভ হইল। খেয়াল হইল এ শরীরও পরিবেশন করিবে। খুকুনীকে সঙ্গে নিয়া গেলাম। ছেলেরা জিনিষপত্র আনিয়া দেয়, আমরা দুজনে পাতে পাতে দিতেছি। দেখিলাম একজনের গায়ে ও হাতে কুষ্ঠ রোগ। সে হাতেও খাইতে পারে না। নিকটে যাইয়া বলিলাম — আমি খাওয়াইয়া দিই। সে না না করিতে লাগিল ও একটি চামচ দিয়া নিজে খাইতে আরম্ভ করিল। একদলের যখন খাওয়া হইল, তখন ভোলানাথ বলিল — তোমরা চলিয়া আস, এখন ছেলেরা পরিবেশন করিবে। ইতিমধ্যে দেখা গেল, খুব জোরে বৃষ্টি আসিতেছে। এ শরীরের খেয়াল হইল ঘরের বাহিরে থাকিবে। তখন বড় বড় ফোঁটা পড়িতেছে। এ শরীরকে সকলে ভিতরে যাইতে ডাকে, কিন্তু এখানে ভিতরে যাইবার ভাবই নাই। পরে দেখা গেল, দ্বিতীয় দলের খাওয়া হইলে, এ শরীরও ঘরে চলিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে জোরে বৃষ্টি নামিল। সন্ধ্যা হইলে শশাঙ্কবাবু খাইতে ডাকিল। বলিলাম, সকলকে ডাক। কেহ কেহ বলিয়া উঠিল — আমরা খাইব না। সকলের জন্য ত নয়, কেবল কাঙ্গালীদের জন্য আয়োজন হইয়াছে। তখন কয়েকটি ছেলে বলিয়া উঠিল — আমরা মায়ের হাতে খাইব। এইসব গোলমাল শুনিয়া বলিলাম — কাঙ্গাল কে? আমরা সবাই ত কাঙ্গাল। কাঙ্গালী

কাহাকে বলে ? সকলেই ত খাইয়া জীবন ধারণ করে ও শরীর বস্ত্রে ঢাকে। আসল ধনে যে কাঙ্গাল, সেই-ই ত কাঙ্গালী। এই বলিতে বলিতে, কাঙ্গালীরা বাহিরে যে জায়গায় খাইয়া গিয়াছে ও এখনো কেহ কেহ খাইতেছে সেইস্থানে সকলকে নিয়া বসিলাম। অন্ধকার হইয়াছিল, বলিলাম — কাঙ্গালীর আর বেশী আলোর দরকার কি ? সামান্য যা আছে ইহাতেই চলিবে। খাওয়া শেষ হইলে সাহবাগে ফিরিলাম।

চরণ স্পর্শ করিয়া প্রণাম

ঐ স্কুলে কীর্তনে এ শরীরের অবস্থাদি লক্ষ্য করিয়া অনাথের কেমন একটি ভাব হইল। সে দুই দিন না খাইয়া না ঘুমাইয়া আছে। সন্ধ্যার সময় সাহবাগে আসিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলে — আমি মায়ের চরণে স্পর্শ করিয়া প্রণাম না করা পর্যন্ত কিছুই খাইব না। ভোলানাথ আমাকে অনেক পীড়াপীড়ি করিলে বলিলাম — আচ্ছা। সেইদিন অনাথের উপলক্ষ্যে সকলে প্রণাম করিল, তাহার পর দিনও অনাথ প্রণাম করিল। সেই হইতে কথা হইল মাসে ঐ তারিখে ঐ সময়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে যে যে পারিবে প্রণাম করিবে। ইহা শুনিয়া যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল, সকলে আসিল ও ঘড়ি ধরিয়া প্রণাম করিল। এ শরীর দাঁড়াইয়াছিল, পাঁচ মিনিট হইয়া যাইতেই আপনা হইতে মাটিতে বসিয়া পড়িল। ক্রমে তাহা বন্ধ হইয়া গেল।

শ্রীশ্রীমায়ের একটুখানি হস্তলিপির জন্য অনেক প্রার্থনা করা হইয়াছিল। তিনি তাহাতে বলেন — "আমি ত ইচ্ছা করিয়া কিছু করিতে পারি না, যদি সময় হয় পাইবি।"

সৌভাগ্য বশতঃ ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের ৪ঠা আষাঢ় যে লিপি করেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল।

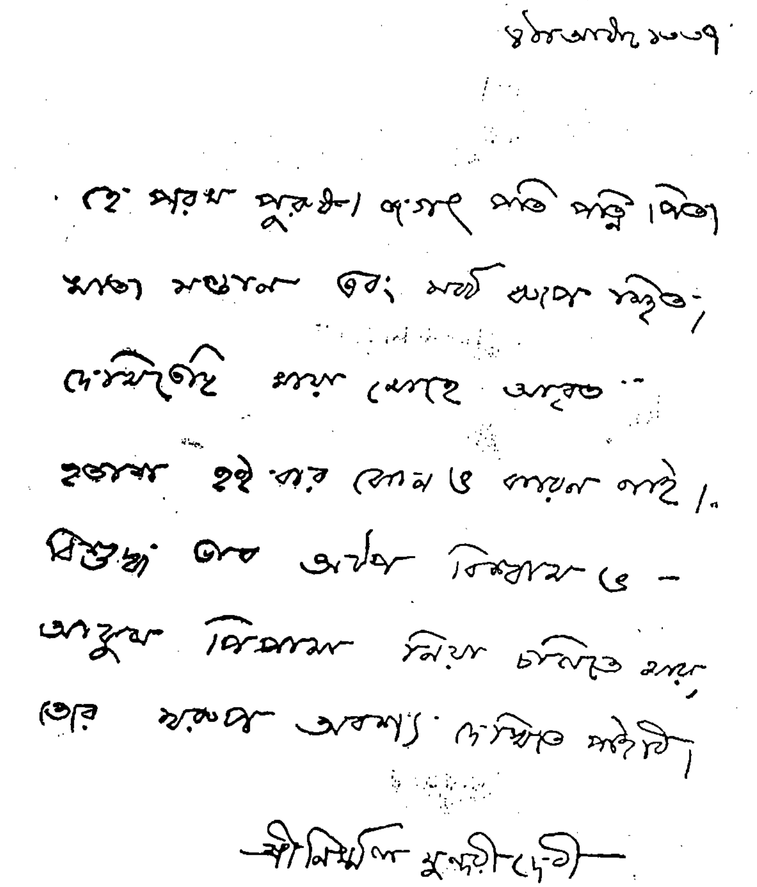

(শ্রীশ্রীমায়ের হস্তাক্ষর)